ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সূচীপত্র

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে,
কর্মরথের ঘড় ঘড়ানি
যে মুহূর্তে থামে,
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক—
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ।
ঘোলা মনের এই-যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চার দিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

পষ্ট আলোর সৃষ্টি-পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কী।
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়ম-ঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে—
ওরা কী-যে দেয় না জবাব
কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি,
বাকিটা সব আঁধার,
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি,
বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা॥

উদয়ন
৫ জানুয়ারি ১৯৪১

হুচি

মুরল দাদার আনল টেনে ওলাদম দিঘির পাড়ে
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রাম ছাগলের ঘাড়ে।
মনির মিঞা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য।
রাম ছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজেরে ডুগডুগি,
কালো মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি।

রামছাগলের মোটা গলার ভ্যাভ্যা রবের ডাকে,
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচর পারে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে,
বাতাস ঘুরে ঘনঘন কোদাল যেন পাড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হুলুস্থুলি, বকের ভাঙে ধ্যান।
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।

হাঁচির শব্দ এত মানি, এটা গুজব মিথ্যে
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধাঁধাঁ, রাগল অনেক পক্ষে,
বল্লে, "ফিজিক্স্ পড়ে কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা, পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ সে।"
এই নিয়ে দুই দলে মিলে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া,
হায়রে কারো ভাঙল কপাল, কেউবা হোলো খোঁড়া।
গোলদিঘি লালদিঘি জুড়ে বীরপুরুষের চড়াই,
সমুদ্দুরের এ পারেতে এরেই বলে লড়াই।
সিন্ধু পারে মৃত্যুদূতের চলছে নাচানাচি,
বাংলা দেশের তেঁতুল বনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা অত্যুক্তি হোক, — আদম দিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রাম ছাগলের ঘাড়ে।
ছেলেরা সব হাত তালি দেয় বাজায়ে ঝুম্‌ঝুমি,
গভীর জলে কাৎলা খেলায়, জল ওঠে ঘুম্‌ঘুমি॥

রবীন্দ্রনাথ

ছড়া : সংক্ষিপ্ত পূর্বপাঠের পাণ্ডুলিপি-চিত্র

১

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগ্‌ডুগি।
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।
রামছাগলের ভারী গলায় ভ্যা ভ্যা রবের ডাকে
সুড়্‌সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
হাঁচির পরে সারি সারি হাঁচি নামার চোটে
তেঁতুলবনে ঝড়ের দমক যেন মাথা কোটে,
গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খ'সে খ'সে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া,
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বউ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।

টেবিলেতে তুফান ওঠে চা-পেয়ালার তলে,
বিষম লেগে শৌখিনদের চোখ ভেসে যায় জলে।
বিদ্যালয়ের মঞ্চ-'পরে টাক-পড়া শির টলে—
পিঠ পেতে দেয়, চ'ড়ে বসে টেরিকাটার দলে।
গুঁতো মেরে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়,
একটু এদিক-ওদিক হলে বিষম দাঙ্গা বাধায়।
লোকে বলে, কলঙ্কদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাই তো সবই উলট-পালট, উপর-নামন নীচে,
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা ; রাগল অপর পক্ষে—
বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্-সে।
এর পরে দুই দলে মিলে ইঁট-পাটকেল ছোঁড়া,
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া—
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ পারেতে এ'কেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।

সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চ'ড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজে রে ডুগ্‌ডুগি,
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি॥

কালিম্পং
১৫ মে ১৯৪০

২

কদমাগঞ্জ উজাড় করে
আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় প'ড়ে নৌকোডুবি
হল যখন কালদহে
তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্তা কদমা যে
পাঁচ মোহনার কৎলু-ঘাটে
ব্রহ্মপুত্রনদ-মাঝে।
আসামেতে সদ্‌কি জেলায়
হাংলুফিড়াং পর্বতের
তলায় তলায় ক'দিন ধরে
বইল ধারা শর্বতের।
মাছ এল সব কাৎলাপাড়া
খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে
পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি
ডিগবাজি খায় কাৎলা,
চাঁদা মাছের সরু জঠর
রইল না আর পাৎলা।

শেষে দেখি ইলিশ মাছের
জলপানে আর রুচি নাই,
চিতল মাছের মুখটা দেখেই
প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি
মিথ্যে এ মাছ কোটো ভাই—
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে
মিঠাই গজার ছোটো ভাই।
মেছোনিকে গিন্নি বলেন,
ঝুড়ির ঢাকা খুলো না,
মাছের রাজ্যে কোথাও যে নেই
এ মৌরলার তুলনা।
বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম,
ব্রহ্মা কি কাজ ভুলল,
বিধাতা কি শেষ বয়সে
ময়রা-দোকান খুলল।
যতীন ভায়ার মনে জাগে
ক্রমবিকাশ থিয়োরি,
গলব্ল্যাডারে ক্রমে ক্রমে
চিনি জমছে কি ওরই।
খগেন বলে, মাছের মধ্যে
মাধুর্য নয় পথ্যাচার,

চচ্চড়িতে মোরব্বাতে
একাত্মবাদ অত্যাচার।
বেদান্তী কয়, রসনাতে
রসের অভেদ গলতি,
এমন হলে রাজ্যে হবে
নিরামিষের চলতি।
ডাক পড়েছে অধ্যাপকের
জামাইষষ্ঠী পার্বণে,
খাওয়ায় তাকে যত্ন ক'রে
শাশুড়ি আর চার বোনে।
মাছের মুড়ো মুখে দিয়েই
উঠল জেগে বকুনি,
হাত নেড়ে সে তত্ত্বকথা
করলে শুরু তখুনি—
কলিযুগের নিমক খেয়ে
আমরা মানুষ সকলেই,
হঠাৎ বিষম সাধু হয়ে
সত্য যুগের নকলেই
সব জাতেরই নিমকি থেকে
নিমক যদি হটিয়ে দেয়,
সকল ভাঁড়েই চিনির পানার
জয়ধ্বনি রটিয়ে দেয়,

চিনির বলদ জোড়ে এসে
সকল মিটিং কমিটি,
চোখের জলেই নোন্‌তা হবে
বাংলাদেশের জমিটি।
নোনার স্থানে থাকবে নোনা,
মিঠের স্থানে মিষ্টি,
সাহিত্যে বা পাকশালাতে
এরেই বলে কৃষ্টি।
চিনি সে তো বার-মহলের
রক্তে বসত নোন্‌তার—
দোকানে প্রাণ মিষ্টি খোঁজে,
নুন যে আপন ধন তার।
সাগরবাসের আদিম উৎস
চোখের জলে খুলিয়ে দেয়,
নির্বাসনের দুঃখটা তার
আখের খেতে ভুলিয়ে দেয়।
অতএব এই— কী পাগলামি,
কলম উঠল ক্ষেপে,
মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে
মিলের স্কন্ধে চেপে।
কবির মাথা ঘুলিয়ে গেছে
বৈশাখের এই রোদে,

চোখের সামনে দেখছে কেবল
মাছের ডিমের বোঁদে।
ঠাণ্ডা মাথায় ঘুচুক এবার
রসের অনাবৃষ্টি,
উলটো-পালটা না হয় যেন
নোন্‌তা এবং মিষ্টি।

[মংপু
২৮ এপ্রিল—২ মে ১৯৪০]

৩

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে বছর পুষেছিল এক পাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকা-বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
প্যারাগ্রাফে ঠোক্কর লাগে তার চক্ষে।
তিন দিন ধরে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয়
কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ
পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।
'রানাঘাট সমাচারে' লিখেছে রিপোর্টার—
আঠারোই অঘ্রানে শুরু হতে ভোরটার
বেশি বৈ কম নয় ছয়-সাত হাজারে
গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে।
এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার।

ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেণ্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।
এডিটর বলে, এতে পুলিসের গাফেলি ;
পুলিস বলে যে, চলো বুঝেসুঝে পা ফেলি।
ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এ-সব ফসল ফলে কন্‌গ্রেসি শস্যে।
সবজির বাজারেতে মুলো মোচা সস্তায়
পাওয়া গেল বাসি মাল ঝাঁকা ঝুড়ি বস্তায়।
ঝুড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা,
যশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা।
'মহাকাল' লিখেছিল, ভাষা তার শানানো,
চালতা ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো—
বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু পক্ষে,
শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে।
দাঙ্গায় হাঙ্গামে মিছে ক'রে লোক গোনা,
সংবাদী সমাজের কখনো এ যোগ্য না।
আর এক সাক্ষীর আর এক জবানি—
বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী।
যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে,
ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই থেবড়ে।
শুনে এডিটর বলে, এ কি বিশ্বাস্য,
কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাশ্য—

জানি না কি ও পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল !
ভবানী লিখল, এ যে আগাগোড়া লাইবেল।
মাঝে থেকে গায়ে প'ড়ে চেঁচায় আদিত্য—
আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব।
কোন্ বংশে-যে মোর জন্ম তা জান তো,
আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত ;
আমার বোনের যোগ বিবাহের সূত্রে
ভজু গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে।
এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে
গো বটে গোয়ালবাসী জানি তাহা আমি যে।
ঠাট্টার অর্থটা ব্যাকরণে খুঁজতে
দেরি হল, পরদিনে পারল সে বুঝতে।
মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা
এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না।
ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম,
কোথায় তলিয়ে যাবে সাতকড়ি ঘোষ নাম।
জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই
আদালতে কত করে পেয়েছিল সে রেহাই।
ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে,
নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে
তার কথা বলি যদি— এই ব'লে বলাটা
শুরু করে ঘেঁটে দিল্প পঙ্কের তলাটা।

তার পরে জানা গেল গাঁজাখুরি সবটাই,
মাথা-ফাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই।
মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা,
পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা।
আসল কথাটা এই অটলা ও পটলা
বাধালো ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা।
শুধু কুলি চার জন করেছিল গোলমাল,
লাল-পাগড়ি সে এসে বলেছিল 'তোল্ মাল'।
গুড়ের কল্‌সিখানা মেতে উঠে ফেটেছিল,
রাজ্যের খেঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল;
বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার—
দোকানিরা বলেছিল, এ যে ভারি দিকদার।
সাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী,
গ্রামের নিন্দে সে যে সইতেই পারে নি।
নেহাত পারে না যারা পাবলিশ না ক'রে
সব-শেষ পাতে দিল বর্জই আখরে।
প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়।
ঠিকমত সংবাদ লিখেছিল সজনী—
সহ্য না হল সেটা, শুনেছে বা ক'জনই।
জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে
যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে।

আদরের ভাগনের কী কেলেঙ্কারি সে,
বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে।
হিতসাধনী সভার চাঁদা-চুরি কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড।
ছেলেরা দু-ভাগ হল মাগুরার কলেজে—
এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে যে।
চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে,
তারা লাগে দু-দলের সভা-ভাঙা কাজেতে।
দলপতি পশ্চাতে রব তোলে বাহবার,
তার পরে গোলেমালে হয়ে পড়ে যা হবার।
ভয়ে ভয়ে ছি ছি বলে কলেজের কর্তারা,
তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা।

একদা দু এডিটরে দেখা হল গাড়িতে,
পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে।
ফোঁস ক'রে ওঠে ফের পুরাতন কথা সেই,
ঝাঁজ তার পুরো আছে আগে ছিল যথা সেই
একজন বলে বেল, লাউ বলে অন্যে,
দুজনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হন্যে।
দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের।

পয়লা দলের knave, idiot কি কেবল,
liar সে, humbug, cad unspeakable—
এইমত বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা.
প্রকাশ করিতে থাকে দুজনের পটুতা।
অনুচর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ—
কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ভেউ-ভেউ।
হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সবে রঙ্গ—
গার্ড্ এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ।
গার্ড্কে সেলাম করি, বলি— ভাই, বাঁচালি,
টার্মিনাসেতে এল বেল-ছোঁড়া পাঁচালি।
ঝিনেদার জমিদার বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হেলে দুলে হাঁসগুলো চলে বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।

উদয়ন
৯ মার্চ ১৯৪০

৪

বাসাখানি গায়ে-লাগা আর্মানি গির্জার—
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার।
হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁশে,
নালিশটা কী নিয়ে জানে না তা কেহ সে।
সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তক্‌রার,
হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার।
কিংবা মিয়াঁও ব'লে থাবা তুলে ডেকেছিল,
তখন সামনে তার দু ভাইয়ের কে কে ছিল।
সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে,
আওয়াজ যাচাই হল ওস্তাদ আনিয়ে।
কেউ বলে ধা-পা-নি-মা কেউ বলে ধা-মা-রে—
চাঁই চাঁই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, প্যাঁচ মারে কুস্তির—
জজ সা'ব কী করে যে থাকে বলো সুস্থির।

সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সর্দার
চলে এল উটে চড়ে, পিছে ঝাড়ু বর্দার।
উটেতে কামড় দিল, হল তার পা টুটা—
বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।
খেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের,
ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।
বাজারে মেলে না আর আখরোট খোবানি,
কাঁউসিল ঘরে আজ কী নাকানি-চোবানি।
ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণা-বিভাগে—
এ কাবুলি বিড়ালের নাড়ীতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই
মার্জারগুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি।
এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরী—
নাইল-তটিনীতট-বিহারিণী কিশোরী।
রোঁয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
এখনি পাঠানো চাই Wimবিল্‌ডনেতে।
বাঙালি থিসিসওলা পড়ে গেছে ভাব্‌নায়,
ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়।
আর্মানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
কোনোখানে এক তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে।

কেম্ব্রিজ খালি হল, আসে সব স্কলারে—
কী ভীষণ হাড়কাটা করাতের ফলা রে।
বিজ্ঞানীদল এল বর্লিন ঝাঁটিয়ে,
হাত-পাকা জন্তুর-নাড়ীভুঁড়ি-ঘাঁটিয়ে।
জজ বলে, বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
আইডেন্‌টিটি তার আদালতে আনা চাই।
বিড়ালের দেখা নাই— ঘরেও না, বনে না,
মিআঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।
জজ বলে সাক্ষীরে কোন্‌খানে ঢুকোলো,
অত বড় লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো।
পেয়াদা বললে, লেজ গেছে মিউজিয়মে
প্রিভিকৌঁসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে।
জজ বলে, গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান—
পেয়াদা বললে, তারো নয় বড়ো কম মান,
মিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ যত্নেই,
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।
বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগন্ধ—
জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।
তখনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পাচারি,
থেকে থেকে হুংকারে কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, গেল কোথা ফরিয়াদী আসামী!
হুজুর— পেয়াদা বলে, বেটাদের চাষামি!

শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়
বলে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায়
কণ্ঠে এমনি ফাঁস এঁটে দিল জড়িয়ে,
মোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে ॥

উদয়ন
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

৫

ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
দেউল-চূড়ার ত্রিশূলে ;
কলুবুড়ি শাকসবজি
তুলেছে পাঁচমিশুলে।
চাষী খেতের সীমানা দেয়
উঁচু ক'রে আল তুলে ;
নদীতে জল কানায় কানায়,
ডিঙি চলে পাল তুলে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা,
হাতে পানের কৌটা,
ঘোষপাড়াতে হন্‌হনিয়ে
চলে নাপিত-বউটা।
গোকুল ছোঁড়া গুঁড়ি আঁকড়ে
ওঠে গাছের উপুরি,
পেড়ে আনে থোলো থোলো
কাঁচা কাঁচা স্থপুরি।
বর্ষাজলের ঢল নেমেছে,
ছাপিয়ে গেল বাঁধখানা,
পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি
যাচ্ছে দেখা আধখানা।

লখা চলে ছাতা মাথায়
গৌরী ক'নের বর—
ড্যাঙ ড্যাঙাড্যাঙ বাদ্যি বাজে,
চড়কডাঙায় ঘর।

ভাগু মালী লাউডাঁটাতে
ভরেছে তার ঝাঁকাটা,
কামার পিটোয় দুম্‌দুমিয়ে
গোরুর গাড়ির চাকাটা।
মাঠের পারে ধক্‌ধকিয়ে
চলতি গাড়ির ধোঁওয়াতে
আকাশ যেন ছেয়ে চলে
কালো বাঘের রোঁওয়াতে
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা
জাগিয়ে দিল গলিটা—
গিন্নিরা দেয় ছেঁড়া কাপড়
ভর্তি করে থলিটা।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে
বসে আছেন সেজো বউ,
মোচার ঘণ্ট বানাতে সে
সবার চেয়ে কেজো বউ।

গামলা চেটে পরখ করে
দড়ি দিয়ে বাঁধা গাই,
উঠোনের এক কোণে জমা
রান্নাঘরের গাদা ছাই।
ভালুক-নাচের ডুগ্‌ডুগি ওই
বাজছে পাইকপাড়াতে,
বেদের মেয়ে বাঁদর-ছানার
লাগল উকুন ছাড়াতে।
অশথতলায় পাটল গোরু
আরামে চোখ বোঁজে তার,
ছাগল-ছানা ঘুরে বেড়ায়
কচি ঘাসের খোঁজে তার।
ছকু মামী খেতের থেকে
তুলছে মুলো ভাদুরে,
পিঠ আঁকড়ে জড়িয়ে থাকে
ছেলেটা তার আদুরে।
হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ
জুটল এসে দলে দল,
পশলা কয়েক বৃষ্টি হতেই
মাঠ হয়ে যায় জলে জল।
কচুর পাতায় ঢেকে মাথা
সাঁওতালী সব মেয়েরা

ঘোষের বাগান থেকে পাড়ে
কাঁচা কাঁচা পেয়ারা।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে
হাট থেকে যায় হাটুরে,
ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে
চলছে ছুটে কাঠুরে।
নিমের ডালে পাখির ছানা
পাড়তে গেল ওরা কি,
পকেট ভরে নিয়ে গেল
কাঠবিড়ালির খোরাকি।
হালদারদের মেয়েটা ওই
দেখি তারে যখুনি
মাঠে মাঠে ভিজে বেড়ায়,
মা এসে দেয় বকুনি।
গোলাকৃতি গড়নটা ওর,
সবাই ডাকে বাতাবি—
খুদু বলে, আমার সঙ্গে
সাঙাৎনি কি পাতাবি।
পুকুর-পাড়ে ছড়িয়ে আছে
তেলের শিশির কাঁচ-ভাঙা,
জেলের পোঁতা বাঁশের খোঁটায়
বসে আছে মাছরাঙা।

ছড়া

দক্ষিণে ওই উঠল হাওয়া,

বৃষ্টি এখন থামল কি—

গাছের তলায় পা ছড়িয়ে

চিবোয় ভুলু আম্‌লকি।

ময়লা কাপড় হিস্‌হিসিয়ে

আছাড় মারে ধোবাতে,

পাড়ার মেয়ে মাছ ধরতে

আঁচল মেলে ডোবাতে।

পা ডুবিয়ে ঘাটের ধারে

ঘোষপুকুরের কিনারায়

মাসিক-পত্র পড়ছে বসে

থার্ড্‌ ইয়ারের বীণা রায়।

বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে

লক্‌লকি।

বাঁশের পাতা চম্‌কে উঠে

ঝক্‌ঝকি।

চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ওই

ড্যাড্যাঙ ড্যাঙ।

মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে

ডাকছে ব্যাঙ॥

উদীচী

২১ অগস্ট ১৯৪০

৬

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে ;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
আপনি এল ব্যাক্‌টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই।
হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই।
সে বলে, সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাদ্য—
দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশ জনারই শ্রাদ্ধ।
শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচা তেঁতুল দরকার,
বেগুন-মুলোর সন্ধানেতে ছুটল ন্যাড়া সরকার।
বেগুন মুলো পাওয়া যাবে নিল্‌ফামারির বাজারে,
নগদ দামে বিক্রি করে তিন টাকা দাম হাজারে।
ডুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল বানিয়ে দেবে মুড়কি,
সন্দেহ হয় ওজন-মত মিশল তাতে গুড় কি।
সর্ষে যে চাই মন দু-তিনেক ঝোলে-ঝালে বাটনায়,
কালুবাবু তারি খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।
বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ,
তারি সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গম-ভাঙানির খুদ।
ওই শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি ;
দেশ-বিদেশে শহর-গ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।
খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে—
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে !

বালুর চরে আলুহাটা, হাতে বেতের চুপড়ি,
খেতের মধ্যে ঢুকে কালু মুলো নিল উপড়ি।
নদীর পারে কিচির-মিচির লাগালো গাঙ্‌শালিখ যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মুলো-খেতের মালিক যে।
কাঁকুড়-খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীল-কুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিতুই চলে চার-পহরের খাটনি।
কড়া-পড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকনটা,
কপালে তার পত্রলেখা উল্কি-দেওয়া আঁকনটা।
কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে—
মেছনি তার সাতগুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ও পারেতে খড়গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মুন্‌শিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।
রেডিয়োতে খবর জানায়, বোমায় করলে ফুটো—
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।
খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে— বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।

হুইস্‌ল্‌ দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার—
মাথায় মোছে হাতের কালি, সময় না পায় নাইবার।

নন্দ গেল ঘুঘুডাঙায়, সঙ্গে গেল চিন্তে—
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।
লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হল খোঁজাই।
নন্দ পরল রাঙা চেলি, পালকি চ'ড়ে চলল—
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে-হলুদ কল্য।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাঘরা,
জমাদারের মামা পরে শুঁড়তোলা তার নাগরা।
পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাং খটাং,
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।
খয়রাডাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা—
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়, যমালয়ের পয়দা।
আকাশ থেকে নামলো বোমা, রেডিয়ো তাই জানায়—
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে, ছিরকুটে খায় পোকা—
শিস দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

হুইস্‌ল্ বাজে ইস্টিশনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে— গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই
সাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার

ঘোষের শিঙে ব'সে ফিঙে ন্যাজ দুলিয়ে নাচে—
শুধোয় নাচন, সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্ মাছে ?
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে—
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলা ব্যাঙ,
খড়গ্‌পুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাডাং ড্যাং।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা, কলমি-পাড়ের পুকুর—
জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিন-পেয়ে এক কুকুর।
হুইস্‌ল্ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী,
শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের যাত্রী।
গ্যাঁ গোঁ করে রেডিয়োটা— কে জানে কার জিত,
মেশিন্‌গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।
টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে-পরে—
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে!

দিন চলে যায় গুন্‌গুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া,
শান-বাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মৌ,
হীরেদাদার মড়্‌মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।
পুকুর-পাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।

খোকা গেছে মোষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে—
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে।
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড়-পুতুলের বিয়ে,
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।
ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পান্তিহাটে বেতোঘোড়া চলে টুকুর টুকুর।
তালগাছেতে হুতোম্‌থুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাত-পুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয়-পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির নয় সে পরিষ্কার,
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো,
ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে-ঘুনে-ফুক্‌রো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তা-ঘাটে চলতে—
লোকে বলে, সত্যি নাকি— ঘুমোয় বলতে বলতে।

সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উলট-পালট কাণ্ড,
হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড।
সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে,
ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
পা ফেলতে না ফেলতেই হতেছে ক্রোশ পার।
দেখতে দেখতে কখন যে হয় এস্‌পার-ওস্‌পার॥

উদয়ন
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

৭

গলদা চিংড়ি তিংড়িমিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল।
পাকড়াশিদের কাঁকড়া-ডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর--
লেজখানা যায় ছিঁড়ে।
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজ-পাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়
সত্যপীরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট,
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম,
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।
গরানহাটায় সজনেডাঁটা
কিনছে পুলিস সার্জন,
চিৎপুরে ওই নাগা সন্ন্যাসী
কাত হয়ে মরে চারজন।

পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের,
সরষে ক্ষেতের চাষী।
কাঁচালঙ্কার ফোড়ন লাগায়
কুড়োনচাঁদের মাসি।
পটোলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
মুরগিহাটার মিঞা।
শম্ভু বাজায় তম্বুরাটায়
কেঁয়াও কেঁয়াও কিঞা।
ঠন্‌ঠনে আজ বেচে লণ্ঠন
চার পয়সায় আটটা।
মুখ ভেংচিয়ে হেড্‌মাস্টার
মন্তরে করে ঠাট্টা।
চিন্তামণির কয়লাখনির
কুলির ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।
বিরিঞ্চিদের খাজাঞ্চি ওই
চণ্ডীচরণ সেন-জা।
শিলচরে হায় কিলচড় খায়
হস্টেলে যত ছাত্র।
হাজি মোল্লার দাঁড়িমাল্লার
বাকি একজন মাত্র।
দাওয়াইখানায় শিঙাড়া বানায়,
উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়।

কনেস্টেব্‌ল্‌ পেতেছে টেব্‌ল্‌
খুদিরে চায়ের কাপ দেয়।
গুবরে পোকার লেগেছে মড়ক,
তুবড়ি ছোটায় পঞ্চু।
ন্যায়রত্নের ঘাড়ের উপর
কাকাতুয়া হানে চঞ্চু।
সিরাজগঞ্জে বিরাট মিটিং,
তুলো-বের-করা বালিশ।
বংশু ফকির ভাঙা চৌকির
পায়াতে লাগায় পালিশ।
রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে
বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা।
নেড়ানেড়ি দলে হরি হরি বলে,
শেষ হল রামযাত্রা॥

পুনশ্চ
১৯ নভেম্বর ১৯৪০

৮

রাত্তিরে কেন হল মর্জি,
চুল কাটে চাঁদনির দর্জি।
চুমরিয়ে দিল তার জুলফি,
নাপিত আদায় করে full fee।
চাঁদনির রাঁধ্‌নি-সে আসে যায়।
বঁড়শি বেহালা থেকে বাসে যায়।
ভবুরাম ওর পাড়াপড়শী,
বেচে সে লাটাই আর বঁড়শি।
আর বেচে যাত্রার বেয়ালা,
আর বেচে চা খাবার পেয়ালা।
চা খেয়ে সে দিল ঘুম তখুনি,
সইল না গিন্নির বকুনি।
কটকের নেত্ত মজুমদার,
সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার।
কালু সিং দেয় তারে পাক্কা
তিন মন ওজনের ধাক্কা।
হাই তুলে বলে, এ কী ঠাট্টা—
ঘড়িতে যে সবে সাড়ে-আটটা।
চৌকিদারের মেজো শালী সে
পড়ে থাকে মুখ গুঁজে বালিশে।

তাই দেখে গলা-ভাঙা পালোয়ান
বাজখাঁই সুরে বলে, আলো আন্‌।
নীচে থেকে বলে হেঁকে রহমৎ,
বাংলা জবানি তুমি কহো মৎ।
ও দিকে মাথায় বেঁধে তোয়ালে
ভিকুরাম নাচে তার গোয়ালে।
তোয়ালেটা পাদরির ভাইঝির,
মোজা-জোড়া খড়দার বাইজির।
পিরানের পাড়ে দেয় চুমকি,
ইরানেতে সেলাইয়ের ধুম কী।
বোগদাদে তাই যাবে আলাদিন
শাশুড়ি যতই ঘরে তালা দিন।
শাশুড়ির মুখ ঢাকা বুরখায়
পাছে তারে ঠেলা মারে গুর্খায়।
চুরি গেছে গুর্খার ভেপুটি,
এজলাসে চিন্তিত ডেপুটি।
ডেপুটির জুতো মোড়া সাটিনেই,
কোনোখানে দাঁতনের কাঠি নেই।
দাঁতনের খোঁজে লাগে খটকা,
পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।
গাওয়া ঘি সে নয়, সে যে ভয়সা,
সের-করা দাম পাঁচ পয়সা।

বাবু বলে দাম খুব জেয়াদা,
কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা।
উমেদার এল আজ পয়লা।
গোয়াড়ির যত গোড়ো গয়লা।
পয়লায় ঘরে হাঁড়ি চড়ে না,
পদ্মরে ছেড়ে খাঁদু নড়ে না।
পদ্ম সেদিন মহা বিব্রত,
বুধবারে ছিল তার কী ব্রত।
ভাশুর পড়ল এসে সুমুখে,
দুধ খেয়ে নিল এক চুমুকে।
চেপে এল লজ্জা-শরমটা,
টেনে দিল দেড়-হাত ঘোমটা।
চুঁচড়োয় বাড়ি হরিমোহনের,
গঙ্গায় স্নানে গেছে গ্রহণের।
সঙ্গে নিয়েছে চার গণ্ডা
বেছে বেছে পালোয়ান ষণ্ডা।
তাল ঠোকে রামধন মুনশি,
কোমরেতে তিন পাক ঘুনসি।
দিদি বলে, মুখ তোর ফ্যাকাশে,
ভালো করে ডাক্তার দেখা সে।
বলে ওঠে তিনকড়ি পোদ্দার—
আগে তুই উকিলের শোধ্ ধার।

ভিখু শুনে কেঁদে চোখ রগড়ায়,
একদম চলে গেল মগরায়।
মগরায় খুদি নিয়ে খুঞ্চে
খেজুরের আঁটিগুলো গুনছে।—
যেই হল তিন-কুড়ি পাঁচটা,
দেখে নিল উনুনের আঁচটা।
ননদের ঘরে ক'রে ঘি চুরি
তখনি চড়িয়ে দিল খিচুড়ি।
হল না তো চালে ডালে মেলানো,
মুশকিল হবে ওটা গেলানো।
সাড়া পায় মাছওয়ালা মিনসের,
বলে, পাকা রুই চাই তিন সের।
বনমালী মাছ আনে গামছায়,
বলে ও যে এক্ষুনি দাম চায়।
আচ্ছা, সে দেখা যাবে কালকে—
ব'লেই সে চলে গেল শালকে।
মুনশি যখন লেখে তৌজি,
জলে নামে শালকের বউ ঝি।
শালকের ঘাটে ভাঙা পালকি—
কালু যাবে বানিচঙে কাল কি।
বানিচঙে ঢেঁকি পাকা গাঁথনি,
ধান কোটে কালুদার নাৎনি।

বানিচণ্ড কোন্ দেশে কোন্ গাঁয়
কে জানে সে যশোরে কি বনগাঁয়।
ফুটবলে বনগাঁর মোক্তার
যত হারে, তত বাড়ে রোখ তার।
তার ছেলে হরেরাম মিত্তির,
আঁক ক'ষে ব্যামো হল পিত্তির।
মুখ চোখ হয়ে গেল হোল্‌দে,
ওরে ওকে পলতার ঝোল দে।
পলতা কিনতে গেল ধুবড়ি,
কিনল গুগলি এক চুবড়ি।
হুগলির গুগলি কী মাগগি,
ভাঙা হাটে পাওয়া গেল ভাগ্যি।
ধুবড়িতে মানকচু সস্তা,
ফাউ পেল কাগজ দু বস্তা।
দেখে বলে নীলমণি সরকার—
কাগজে হরুর খুব দরকার।
জ্যামিতি অতীত তার সাধ্যর,
যতই করুন তারে মারধোর।
কাগজে বসিয়ে রেখে নারকেল
পেন্‌সিলে কাটে ব'সে সার্‌কেল্।
সার্‌কেল্ কাটতে সে কী বুঝে
খামকাই ঠেকে গেল ত্রিভুজে।

সইতে পারে না তার চাপুনি,
পালাজ্বরে দিল তারে কাঁপুনি।
শ্রাদ্ধবাড়িতে লেগে ঠাণ্ডা
হেঁচে মরে ত্রিবেণীর পাণ্ডা।
অবেলায় খেতে বসে দারোগা,
সির সির করে ওঠে তারো গা।
টাট্টু ঘোড়ার এক গাড়িতে
ডাক্তার এল তার বাড়িতে।
সে ঘোড়াটা বেড়া ভাঙে নন্দর,
চিহ্ন রাখে না খেত-খন্দর।
নন্দ বিকেলে গেল হাবড়ায়,
সারি সারি গাড়ি দেখে ঘাবড়ায়।
গোনে ব'সে— তিন চার পাঁচ সাত,
আউড়িয়ে যায় সারা ধারাপাত।
গুনে গুনে পারে না যে থামতে,
গল্‌গল্‌ ক'রে থাকে ঘামতে।
নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ,
মনে পড়ে পয়ারের পদ্য।
কাশীরাম দাসে আনে পুণ্য,
দশে আর বিশে লাগে শূন্য।
'কাশীরাম কাশীরাম' বোল দেয়,
সারাদিন মনে তার দোল দেয়,

আঁকগুলো মাথা থাকে ঘোলাতে.
নন্দ ছুটেছে হাটখোলাতে।
হাটখোলা শ্বশুরের গদি তার,
সেইখানে বাসা মেলে যদি তার
এক সংখ্যায় মন দেবে ঝাঁপ—
তার চেয়ে বেশি হলে হবে পাপ।
আর নয়, আর নয়, আর নয়,
কখনোই দুই তিন চার নয়॥

উদীচী
২০ জানুয়ারি ১৯৪০

৯

আজ হল রবিবার— খুব মোটা বহরের
কাগজের এডিশন ; যত আছে শহরের
কানাকানি, যত আছে আজগবি সংবাদ,
যায় নিকো কোনোটার একটুও রঙ বাদ।
'বার্তাকু' লিখে দিল— 'গুজরানওয়ালায়
দলে দলে জোট করে পঞ্জাবি গোয়ালায়।
বলে তারা, গোরু পোষা গ্রাম্য এ কারবার
প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
স্তূপ রচা দুই বেলা খড়্‌ভূষি-ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুল-মাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
অন্তর্‌ভূত হবে বই-গেলা বিদ্যের।
যত অভ্যেস আছে লেজ ম'লে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো !'
'গদাধরে' রেগে লেখে— 'এ কেমন ঠাট্টা,
বার্তাকু পরে পরে সাতটা কি আটটা

যা লিখেছে সব ক'টা সমাজের বিরোধী,
মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি।
সেদিন সে লিখেছিল, ঘুঁটে চাই চালানো,
শহরের ঘরে ঘরে ঘুঁটে হোক জ্বালানো।
কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে
ঝরিয়াকে করে দিক একদম দেউলে।
সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী
শহরের বুক জুড়ে আছে যেন হেঁয়ালি।
ঘুঁটে দিয়ে ভরা হোক, এই এক ফতোয়ায়
একদিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয়।
গোয়ালারা চোনা যদি জমা করে গামলায়
কত টাকা বাঁচে তবে জল-দেওয়া মামলায়।
বার্তাকু কাগজের ব্যঙ্গে যে গা জ্বলে,
সুন্দর মুখ পেলে লেপে ওরা কাজলে।
এ-সকল বিদ্রূপে বুদ্ধি যে খেলো হয়,
এ দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়।'
গদাধর কাগজের ধমকানি থামল,
হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল।
বলে, 'ভায়া, এ জগতে ঠাট্টা-সে ঠাট্টাই—
গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।
মাস্টার না হয়ে যে হলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।

এডুকেশনের পথে হয় নি যে মতি তব,
এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব।'

অবশেষে এ দুখানা কাগজের আসরে
বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে।

উদয়ন
১৭ মার্চ ১৯৪০

১০

সিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির
পাঁজি দেখে সতেরোই চৈত্তির।
বলে আজ যেতে হবে মথুরায়,
সেথা তার মামা আছে সতু রায়।
বেস্পতিবারে গাড়ি চ'ড়ে তার
চাকা ভাঙে নরসিংগড়ে তার।
তাই তার যাত্রাটা ঘুরুলে,
ফিরে এসে চলে গেল স্থরুলে।
ঠিক হল যেতে হবে পেশোয়ার,
সেথা আছে সেজো মাসি মেসো আর।
এসে দেখে একা আছে বউ সে,
মেসো গেছে পানিপথে পৌষে।
হাথুয়ার কাছাকাছি না যেতেই
বাঙালি সে, ধরা পড়ে সাজেতেই।
চোখ রাঙা ক'রে বলে দারোগা,
থানামে লে কর্ হম্ মারো গা।
ছোটো ভাই বেঁধে চিঁড়ে মুড়কি
সন্ন্যাসী হয়ে গেল রুড়কি।

ঠোক্কর খেয়ে পড়ে বোঁচকায়,
কুক্ষণে পা ছুখানা মোচকায়,
শেষে গেল সুলতানপুরে সে,
গান ধরে মুলতান-সুরে সে।
বেলাশেষে এল যবে বামড়ায়
কী ভীষণ মশা তাকে কামড়ায়।
বুঝলে সে শান্ত যে হওয়া দায়,
গোরুর গাড়িতে চলে নওয়াদায়।
গোরুটা পড়ল মুখ থুবড়ি
ক্রোশ দুই থাকতেই ধুবড়ি।
কাটিহারে তুলে তাকে ধরল,
তখন সে পেট ফুলে মরল।
শুনেছে তিসির খুব নামো দর,
তাই পাড়ি দিতে গেল দামোদর।
দামোদরে বুধুরাম খেয়া দেয়,
চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায়।
শংকর ভোরবেলা চুঁচড়োয়
হাউ হাউ শব্দে গা মুচড়োয়।
নাড়াজোলে বড়োবাবু তখুনি
শুরু করে বংশুকে বকুনি।
বংশুর যত হোক খাটো আয়,
তবু তার বিয়ে হবে কাটোয়ায়।

বাঁধা হুঁকো বাঁধা নিয়ে খড়দার
ধার দিলে মতিরাম সর্দার।
শাঁখা চাই বলতেই শাঁখারি
বলে, শাঁখা আছে তিন টাকারই।
দর-কষাকষি নিয়ে অবশেষ
পুলিশ-থানায় হল সব শেষ।
সাসারামে চলে গেল লোক তার
খুঁজে যদি পাওয়া যায় মোক্তার।
সাক্ষীর খোঁজে গেল চেউকি,
গাঁজাখোর আছে সেথা কেউ কি।
সাথে নিয়ে ভুলুদা ও শশিদি
অনুকূল চলে গেছে জসিদি।
পথে যেতে বহু দুখ ভুগে রে
খোঁড়া ঘোড়া বেচে এল মুঙেরে।
মা ও দিকে বাতে তার পা খুঁড়ায়,
পড়ে আছে সাত দিন বাঁকুড়ায়।
ডাক্তার তিনকড়ি সাণ্ডেল
বদলি করেছে বাসা বাণ্ডেল।
তাই লোক পাঠায় কোদার্মায়,
চিঠি লিখে দিল সে ভোঁদার মায়।
সাতক্ষীরা এল চুপিচুপি সে,
তার পরে গেল পাঁচথুপি সে।

সেখানেতে মাছি প'ল ভাতে তার,
ঝগড়া হোটেলবাবু-সাথে তার।
অতুল গিয়েছে কবে নাসিকে,
সঙ্গে নিয়েছে তার মাসিকে।
রাঁধবার লোক আছে মান্দ্রাজি
সাত টাকা মাইনেয় আধ-রাজি।
লালচাঁদ যেতে যেতে পাকুড়ে
খিদেটা মেটায় শসা কাঁকুড়ে।
পৌঁছিয়ে বাহাদুরগঞ্জে
হাঁসফাঁস করে তার মন যে।
বাসা খুঁজে সাথী তার কাঙলা
খুলনায় পেল এক বাঙলা।
শুধু একখানা ভাঙা চৌকি,
এখানেই থাকে মেজো বউ কি।
নেমে গেল যেথা কানু জংশন,
ভিমরুলে করে দিল দংশন।
ডাক্তারে বলে চুন লাগাতে
জ্বালাটাকে চায় যদি ভাগাতে।
চুন কিনতে সে গেল কাটনি,
কিনে এল আমড়ার চাটনি।
বিকানিরে পড়ল সে নাকালে,
উটে তাকে কী বিষম ঝাঁকালে।

বাড়িভাড়া করেছিল শ্বশুরই,
তাই খুশি মনে গেল মশুরি।
শ্বশুর উধাও হল না ব'লে,
জামাই কি ছাড়া পাবে তা ব'লে।
জায়গা পেয়েছে মালগাড়িতে,
হাত সে বুলাতেছিল দাড়িতে,
ঝাঁকা থেকে মুরগিটা নাকে তার
ঠোকর মেরেছে কোন্ ফাঁকে তার।
নাকের গিয়েছে জাত রটে যায়,
গাঁয়ের মোড়ল সব চটে যায়।
কানপুর হতে এল পণ্ডিত,
বলে, এরে করা চাই দণ্ডিত।
লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া
নাসাপথে পাখা দাও গুঁজিয়া।
হাঁচি তবে হবে শত শতবার,
নাক তার শুচি হবে ততবার।
তার পরে হল মজা ভরপুর
যখন সে গেল মজাফরপুর।
শালা ছিল জমাদার থানাতে,
ভোজ দিল মোগলাই খানাতে।
জৌনপুরি কাবাবের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা সন্ধে।

দেহটা এমনি তার তাতালে
যেতে হল মেয়ো হাসপাতালে
তার পরে কী যে হল শেষটা
খবর না পাই ক'রে চেষ্টা ॥

উদয়ন
৭ মার্চ ১৯৪০

১১

মাঝ রাতে ঘুম এল— লাউ কেটে দিতে
ছিঁড়ে গেল ভুলুয়ার ফতুয়ার ফিতে।
খুড়ু বলে, মামা আসে, এই বেলা লুকো ;
কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকো।
নাতি আসে হাতি চ'ড়ে, খুড়ো বলে— আহা,
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা।
তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী সে হাসে,
বলে, আজ ইংরিজি মাসের আঠাশে।
তাড়া খেয়ে ন্যাড়া বলে, চলে যাব রাঁচি ;
ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল বাঁদরের হাঁচি।
কুকুরের লেজে দেয় ইন্‌জেক্‌শ্যান,
মাস্থলি টিকিট কেনে জলধর সেন।
পাঁজি লেখে, এ বছরে বাঁকা এ কালটা,
ত্যাড়াবাঁকা বুলি তার উলটা-পালটা ;
ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর,
জানি নে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর॥

উদয়ন

৫ ডিসেম্বর ১৯৪০। বিকাল

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বর্তমান গ্রন্থের মুদ্রণ শুরু হইলেও, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮ ভাদ্রে। ১৩৫৫ পৌষে ষড়্‌বিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সংকলন। পূর্বসংস্করণ, পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি -পর্যালোচনায় প্রচলিত কতকগুলি পাঠ ও মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধন করিয়া, বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করা হইল। পাণ্ডুলিপিতে বা সাময়িক পত্রে ইহার অনেকগুলি কবিতার শিরোনাম মুদ্রিত ; সেই-সকল শিরোনামের ও প্রথম প্রচারের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।—

সংখ্যা। শিরোনাম : সূচনা — সাময়িক পত্র। পৃষ্ঠা

প্রবেশক। প্রশ্ন : অলস মনের আকাশেতে

শনিবারের চিঠি। মাঘ ১৩৪৭। ৪৪৫

প্রবাসী : কষ্টিপাথর। ফাল্গুন ১৩৪৭।৬৩৭

১। ছড়া : সুবল দাদা আনল টেনে (সংক্ষিপ্ত)

শনিবারের চিঠি। ভাদ্র ১৩৪৮।৫৯৩

২। কদমা : কদমাগঞ্জ উজাড় করে — [রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি : ১৮৩

৩। পরিস্থিতি : ঝিনেদার জমিদার — প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৭।১

৪। মামলা : বাসাখানি গায়ে লাগা — প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।১৫৩

৫। চলচ্চিত্র : ছেঁড়া মেঘের — শারদীয়া আনন্দবাজার। ১৩৪৭।১৬৩

৬। শ্রাদ্ধ : খেঁদুবাবুর এঁধোপুকুর — প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪৬।৭১১

৭। অবচেতনার অবদান : গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি

শনিবারের চিঠি। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬।২৯৫

৯। রবিবারী সংস্করণ : আজ হল রবিবার — বঙ্গলক্ষ্মী।···

প্রবাসী : কষ্টিপাথর। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।২২১

১০। ভবঘুরী : সিউড়িতে হরেরাম [রবীন্দ্র-সংশোধিত পাণ্ডু.গুচ্ছ। নকল

১১। উল্টোপাল্টা : মাঝরাতে ঘুম এল — [পূর্ববৎ

২।৮।১০।১১ -সংখ্যক ছাড়া সাময়িক পত্রে পাওয়া যায় না। গ্রন্থের প্রথম ছড়াটির সংক্ষিপ্ত পূর্বপাঠ শনিবারের চিঠিতে তথা বর্তমান গ্রন্থে লেখাঙ্কন চিত্রে দেখা যাইবে। পূর্বোক্ত পত্রে সপ্তম ছড়া ছাপা হয় কবি-কর্তৃক '২১।১১।৩৯' তারিখে আঁকা এক কৌতুকচিত্র-সহ, মন্তব্যছলে লেখা হয় 'সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি' এবং কবিতার ভূমিকায় থাকে: 'অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের, অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।'

রবীন্দ্রনাথের এক পাণ্ডুলিপি হইতে আর-এক পাণ্ডুলিপিতে, অন্যের হাতের এক নকল হইতে আর-এক নকলে (প্রায়শই কবির নিজের হাতের বিবিধ 'সংশোধনে' ও কম-বেশি সংযোজনে সমৃদ্ধ এবং তাৎপর্যবান্), ছড়ার অধিকাংশ কবিতায় পাঠের পরিবর্তন বা বিবর্তন অল্প হয় নাই—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ছড়াতে অর্থ যাই থাক্ অথবা প্রচ্ছন্ন থাক্, 'ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়' এ-সবই বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকায় (১৩৪৪)। সেইসঙ্গে বলিয়াছেন ছড়ায় 'প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে।··· ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলার শব্দের চেহারা। আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে দুটো উল্টো কথা বলে। এক হচ্ছে—আলোর রূপ ঢেউয়ের রূপ, আর হচ্ছে— সেটা কণাবৃষ্টির রূপ। বাংলা সাধুভাষার রূপ ঢেউয়ের, বাংলা প্রাকৃত ভাষার রূপ কণাবৃষ্টির।

বহুপূর্বে 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় (১৩০১) ছড়ার চিত্রময়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যেমন, রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন উহার অসংলগ্নতা ও

নিত্যপরিবর্তনশীলতা মেঘের মতো, স্বপ্নের সদৃশ।[1] এ-সবই নূতন করিয়া স্পষ্ট হয় আলোচ্য রচনায় ও রচনার প্রক্রিয়ায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার প্রয়োজন এখানে নাই, বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে কেবল একটি ছড়ার পাণ্ডুলিপি-ধৃত পূর্বরূপ উদ্ধার করা চলে—

চলচ্চিত্র

মাথার থেকে ধানী রঙের ওড়নাখানা সরে যায়,
চীনের টবে হাস্নুহানার গন্ধে বাতাস ভরে যায়।
তিনটে পাঠান মালী আছে নবাবজাদার বাগানে,
দুয়ারে তার ডালকুত্তো চীৎকারে-রাত-জাগানে।
ধানশ্রীতে সানাই বাজে কুঞ্জবাবুর ফটকে,
দেউড়িতে ভিড় জমে গেছে নাটক দেখার চটকে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা, হাতে পানের কৌটা,
ঘোষপাড়াতে হন্‌হনিয়ে চলে নাপিত-বউটা।
গাছে চড়ে রাখাল ছোঁড়া জোগায় কাঁচা সুপুরি,
দুবেলা পান বাঁধা আছে, আরো আছে উপুরি।
সের পঁচিশেক কদমা ছিল কলুবুড়ির ধামাতে,
জলের মধ্যে উলটে গেল ঘাটের ধারে নামাতে।
মাছ এল তাই কাৎলাপাড়া খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি, ডিগবাজি খায় কাৎলা—
চাঁদা মাছের চ্যাপটা জঠর রইল না আর পাৎলা।
শেষে দেখি ইলিশ মাছের মিষ্টিতে আর রুচি নাই,
চিতল মাছের মুখটা দেখেই প্রশ্ন তারে পুছি নাই।

১ 'ছেলেভুলানো ছড়া' ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিকের সাধনায় 'মেয়েলি ছড়া' নামে মুদ্রিত ও পরে লোকসাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত।

ননদকে ভাজ বললে, তুমি মিথ্যে এ মাছ কোট, ভাই,
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে মিঠাই-গজার ছোটো ভাই।
রোদের তাপে হাওয়া কাঁপে, মাঠের বালি তেতে যায়
পাকুড়তলার ঘাটে গোরু দিঘিতে জল খেতে যায়।
ডিঙি চলে ধিকি ধিকি, নদীর ধারা মিহি—
দুপুর-রোদে আকাশে চিল ডাক দিয়ে যায় চিঁহি।
লখা চলে ছাতা মাথায় গৌরী কনের বর—
ড্যাং ড্যাঙাড্যাং বাদ্যি বাজে ; চড়কডাঙায় ঘর।

হাঁটুজলে পার হয়ে যায় মরা নদীর সোঁতা,
পাড়ির কাছে পাঁকে ডিঙি আধখানা রয় পোঁতা।
এনামেলের-বাসন-ভরা চলেছে এক ঝাঁকা,
কামার পিটোয় দুম্‌দুমিয়ে গোরুর গাড়ির চাকা।
মাঠের পারে ধক্‌ধকিয়ে চল্‌তি গাড়ির ধোঁওয়া,
আকাশ বেয়ে ছেঁটে চলে কালো বাঘের রোঁওয়া।
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা জাগায় গলিটাকে,
কুকুরগুলোর অসহ্য হয়— আর্তনাদে ডাকে।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে বসে আছেন কন্যে,
মোচার ঘণ্ট বানাতে চান কোন্ মানুষের জন্যে।
গামলা চেটে পরখ করে গাইটা দড়ি-বাঁধা,
উঠোনের এক কোণে জমা কয়লাগুঁড়োর গাদা।
ভালুক-নাচের ডুগ্‌ডুগি ওই বাজছে ও পাড়াতে,
কোন্-দিশী ওই বেদের মেয়ে নাচায় লাঠি হাতে।
অশথতলায় পাটল গোরু আরামে চোখ বোজে,
ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায় কচি ঘাসের খোঁজে।
হঠাৎ কখন বাদ্‌লে মেঘ ছুটল দলে দলে,
পশলা কয়েক বৃষ্টি হতেই মাঠ ভাসালো জলে।

মাথায় তুলে কচুর পাতা সাঁওতালি সব মেয়ে,
উচ্চহাসির রোল তুলে যায় গাঁয়ের পথে ধেয়ে।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে হাট ভেঙে যায় হাটুরে,
ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে চলছে ছুটে কাঠুরে।

বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে লক্‌লকি,
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে ঝক্‌ঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ওই ড্যাড্যাং ড্যাং।
মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে ডাকে ব্যাঙ।[২]

২৭।৩।৪০

২৭ মার্চ ১৯৪০ (১৪ চৈত্র ১৩৪৬) তারিখে লেখা এই কবিতায় প্রথম স্তবকের শেষ দশ ছত্রে ছড়ার দ্বিতীয় কবিতার অঙ্কুর বা পূর্বাভাস রহিয়াছে সন্দেহ নাই। ঐ দ্বিতীয় কবিতা 'কদমা' লেখা হয় এই বৎসর মংপুতে ২৮ এপ্রিল হইতে ২ মে তারিখের মধ্যে (১৫~১৯ বৈশাখ ১৩৪৭) এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৬৪। পৃ. ২৩৫-৩৬) শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর সাক্ষ্যে। 'সের পঁচিশেক কদমা' সহজেই কদমাগঞ্জ-উজাড়-করা জাহাজ বা নৌকা -বোঝাই মালে পরিণত হইল, আরো অভূতপূর্ব যাহা কিছু ঘটিল তাহার কৈফিয়ত দেন কবি : 'কলম উঠল ক্ষেপে, / মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে মিলের স্কন্ধে চেপে।'

২ ইতঃপূর্বে ১৩৫০ চৈত্রের সঞ্চয়িতার গ্রন্থপরিচয় অংশে উদ্‌ধৃত এবং পরে শিশুপাঠ্য চিত্র-বিচিত্র কাব্যের (১৩৬১) অঙ্গীভূত।

রবীন্দ্রনাথ তারিখ দেন শেষ স্তবকের পূর্বপাঠ শেষ করিয়া। উহা বর্জন করিয়া পরে যে গ্রাহ্য পাঠ লিখেন (এ স্থলে সংকলিত), তাহার কোনো তারিখ নাই। এটুকু পরিবর্তন অবিলম্বে না হইলেও, হয়তো দু-এক দিনের মধ্যে। উৎকলিত সাময়িক পাঠ, প্রথম না হইলেও তাহার কাছাকাছি মনে হয়।

প্রথম-লেখা চলচ্চিত্রের অবশিষ্ট ছত্রগুলি কবি ত্যাগ করিলেন না। বিবিধ যোগ-বিয়োগের ভিতর দিয়া নবরূপ লইল নবতর চলচ্চিত্র কবিতায় —গ্রন্থে অদ্যাবধি যাহার রচনাকাল ২০ অগস্ট্ নির্দিষ্ট হইলেও, আনন্দবাজার পত্রিকায়: ২১ অগস্ট্ ১৯৪০। বস্তুতঃ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের এক-গুচ্ছ আল্‌গা পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, ছড়ার এই পঞ্চম কবিতার পরিচিত পাঠের নকল একরূপ সমাধা করিয়া '২০।৮।৪০' এই তারিখ দেওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে যোগ করেন শেষ স্তবকের অব্যবহিত পূর্বে ২৮ ছত্র বা ৭ শ্লোক: নিমের ডালে পাখীর ছানা ইত্যাদি। অতএব ২০ অগস্ট্ ১৯৪০ বা ৪ ভাদ্র ১৩৪৭ তারিখে আলোচ্য কবিতার প্রায় সবটা লেখা হইয়া গেলেও, শেষোক্ত ২৮ ছত্র ২১ অগস্ট্ বা ৫ ভাদ্র তারিখে যোগ করা হয়—ইহা মানিয়া লওয়া যায়। ১৩৪৬ সনের ১৪ চৈত্রে যাহার একরূপ সূচনা, ১৩৪৭ বৈশাখে অংশবিশেষ স্বতন্ত্র পরিণতি লাভ করার পরে, তাহার সর্বশেষ রূপান্তর-পরিগ্রহ ১৩৪৭ ভাদ্রের ৪।৫ তারিখে— ইহা কৌতূহলজনক সন্দেহ নাই।

ছড়ার ষষ্ঠ কবিতা 'শ্রাদ্ধ'। নানা যোগ-বিয়োগের ভিতর দিয়া ইহার ক্রমপরিণতি অনুরূপ দীর্ঘকালের ব্যাপার না হইলেও সমান বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার কারণ। রবীন্দ্রসদনের ১৬০-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে ইহার সংক্ষিপ্ত পূর্বতন রূপ (হয়তো প্রথম) এ স্থলে সংকলন করিলে, পরিবর্তনের প্রকৃতি ও পরিমাণ কতকটা বুঝা যাইবে—

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর মাছ উঠেছে ভেসে—
পদ্মমণি চচ্চড়িতে মসলা দিল ঠেসে।
লঙ্কা দিল, আর দিয়েছে কালো জিরের বাটনা,
কালুবাবু আলুর খোঁজে চলে গেছে পাটনা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনী,
রোদে জলে নিতুই চলে চার পহরের খাটনি।

জামাইবাবু হুকুম করেন বিয়ে বাড়ির তোল্ মাল
তাই নিয়ে সব পাইকগুলো লাগায় বিষম গোলমাল [।]
খড়্গপুরের বাজন্দারে যাত্রার গড়ের বাজনাতে
গোমস্তারা ভুলে গেল জমিদারের খাজনাতে।
হুইস্‌ল্ দিল মালগাড়িতে শাৎরাগাছির ড্রাইভার
মাথার মোছে হাতের কালি সময় পায় না নাইবার।
ননদ গেল বিয়ে করতে সঙ্গে গেল চিত্তে,
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।
ধানের কলে সারি সারি গোরুর গাড়ি বয় ধান,
ঘুড়ির কাটাকাটি লাগায় কোন্নগরের ময়দান।
ননদ পরল রাঙা শাড়ি পাল্কি চড়ে চল্‌ল।
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে হলুদ কল্য।
হুইস্‌ল্ শুনে চমকে ওঠে বরের জ্যাঠামশাই,
খোঁজ পড়ে যায় গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই।
সাৎরাগাছির বরের পিসি সাঁতার কাটতে গিয়ে
শাঁখা কোথায় ভেসে গেল করল সে যে কী এ।
মোষের শিঙে বসে ফিঙে ল্যাজ দুলিয়ে নাচে
শুধোয় পিসি শাঁখা আমার নিয়েছে কোন্ মাছে।
মাছের লেজের ঝাপট লাগে শালুক ওঠে দুলে
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে এলো চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে উঠল ডেকে ব্যাঙ,
খড়্গপুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ডাডাংড্যাঙ।
হুইস্‌ল্ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী
শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে গেল বিয়ের যাত্রী।[৩]

—পাণ্ডুলিপি ১৬০

৩ এ পাণ্ডুলিপি কবির খসড়া-খাতা রূপে ব্যবহৃত ১৯৩৯ সনের এক ডায়ারি। এ ক্ষেত্রে মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক 64 ও 65। অল্পপরিমাণ যোগ-বিয়োগ/পরিবর্তন আছে। উল্লিখিত দুই পৃষ্ঠার যথাসম্ভব পরিবর্তনপূর্ব পাঠই এ স্থলে গৃহীত।

খসড়া-খাতায় এই ৩০ ছত্রের অব্যবহিত পূর্বে আছে নবজাতক কাব্যের 'রূপ-বিরূপ' কবিতার খসড়া; অতএব ২৮ জানুয়ারির পরে ইহার রচনা, এটুকু অনুমান করা চলে। অন্য পাণ্ডুলিপিতে (অভিজ্ঞানসংখ্যা ১৬৬) কবি ইহার পরিবর্ধিত পাঠ স্বহস্তে লেখেন ৯২ ছত্রে। শ্রাদ্ধের ঐ পরিণত রূপ প্রকাশ-যোগ্য বিবেচনায় উহার নকল করা হইলে তাহাতে সুস্পষ্ট স্থান-কালের নির্দেশ: উদয়ন / ১১।২।৪০। কিন্তু পরিবর্ধনের ও পরিবর্তনের অন্ত হয় নাই তখনো। রবীন্দ্রসদনে আলগা পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে পরিবর্তিত (অব্যবহৃত) তৃতীয় যে নকল পাওয়া যায় তাহার তারিখ '১৩।২।৪০', ছত্রসংখ্যা ৯৬। এই নকলেই প্রচুর পরিবর্তন না করিয়া (নকলের উপরেই করা হইয়াছে অল্প) রবীন্দ্রনাথ নকলের শেষ পাতা স্বহস্তে পুনরায় লিখিয়া দেন, ফলে ধুয়া বাদে শেষ স্তবকের অন্যত্র অনেক বদল হয় এবং ১০ ছত্র বাড়িয়া যায়। এই প্রায় 'শেষ' পাঠ ১৬৬-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে অনুলিপিকার পুনশ্চ নকল করিয়া শেষে লিখিয়া রাখেন: উদয়ন / ১৭।২।৪০। (প্রবাসীতে ১৬ তারিখের উল্লেখ আছে।) ১০৬ ছত্রের এই পাঠে আর অধিক পরিবর্তন হয় নাই, অর্থাৎ ছত্রবিশেষ বাতিল করা হইয়াছে বা যোগ করা হইয়াছে এমন বলা যায় না। ধুয়াবিহীন শেষ স্তবকের যে পূর্বরূপ কবির আপন লেখায় পাণ্ডু. ১৬৬-ধৃত (প্রথম দিকে), যাহার খুচরা নকলে তারিখ '১১।২।৪০', সেটি এ স্থলে সংকলন করা যায়—

এখন তবে সাঙ্গ করো শ্রাদ্ধের এই ছড়া।
হজম করার পর্ব শেষে আবার হবে পড়া।
ননদ গেছেন বিয়ে করতে রেডিয়ো তার চুপ,
হয় না আকাশ পাতাল জুড়ে আওয়াজ কোনোরূপ।
পাটনী চালায় খেয়াতরী এ বেলা ঐ বেলা
ঘাটের থেকে এগিয়ে নিতে দাঁড় দিয়ে দেয় ঠেলা।
কাঁকনে তার রোদের ঝলক ঠিকরিয়ে দেয় চোখ,
মাসি বলে পানের দাবী করে গাঁয়ের লোক।

তিনপেয়ে ঐ কুকুরকে দেয় পাতের ভাতের আধা,
গুরুঠাকুর এলে দ্বারে দক্ষিণা তার বাঁধা।
পাটনা থেকে কালু এল ঘিরে বসল পাড়া,
অবাক সবাই, যা বলে সে রূপকথার বাড়া।
আমি বাণী বেঁধেছিলুম রূপকথাটাই ঘেঁষে,
আমার কলম দেখা দিল বহুরূপীর বেশে।
বয়স আমার শেষের কোঠায়, যদি নতুন চালে
মাঝে মাঝে ছাড়চিঠি পাই বর্তমানের কালে,
নূতন যুগের আমেজখানা লাগবে আমার হাড়ে
এই ছলনায় কোনোমতে আয়ু আমার বাড়ে
বাতের ব্যথা যাবে কেটে বাড়বে বায়ুর কোপ—
কুণো মনের জড়তাটা হয়তো হবে লোপ॥

—স্বলেখন। পাণ্ডু. ১৬৬

কবিতার আদ্যন্ত পাঠ নকল করা হইলে উল্লিখিত শেষ স্তবক সবটা কাটিয়া সেই স্থলে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লেখেন—

আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে।
আমরা থাকি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের দেশে।
ননদ হেথা বিয়ে করেন স্বপ্ন দেখার বিয়ে
টিয়ের বিয়ে হোত যেথায় লাল গামছা দিয়ে।
ছ পণ কড়ি গুন্‌তে গুন্‌তে শেষ হয়ে যায় বেলা
হিসেব নিতে গিয়ে দেখি সবই মাটির ঢেলা।
বর্গি করে ঘুম পাড়াবার ছড়ায় উপদ্রব,
তিন কন্যে দানের খবর নয়কো অসম্ভব।

—স্বহস্তে পরিবর্তন। সমকালীন নকলে

এই পরিবর্তনের তারিখ জানা নাই। উল্লিখিত শেষ স্তবক-সহ এই পাঠের পুনর্লিপি প্রস্তুত হইলে, সব-শেষে কবি পুনশ্চ যোগ করেন: আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া ইত্যাদি ১৪ ছত্র, যাহা মোটের উপর বলা

যায় প্রবাসী-ধৃত বা ছড়ায় মুদ্রিত 'শ্রাদ্ধ' কবিতার অন্তিম চতুর্দশ ছত্রের আদর্শ-স্বরূপ। ইহারই নকলে তারিখ দেওয়া আছে '১৩।২।৪০' এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে, এবার এই তৃতীয় নকলের উপর অধিক লেখাজোখা না করিয়া উহার শেষ পাতায় পরিবর্তিত পাঠ রবীন্দ্রনাথ পৃথক কাগজে লিখিয়া দিলেন। ফলে, ইতঃপূর্বে যে ৮ ছত্র সংকলন করা হইয়াছে ('আমার ছড়া চলেছে আজ ...নয়কো অসম্ভব।') তাহা ১৮ ছত্রে পরিণত হইল ; ইহাই এ কবিতার শেষ স্তবকের ছত্র ১-১৮। আগের চতুর্দশ (শেষাংশ), এখনকার অষ্টাদশ (সূচনাংশ), উভয় মিলাইয়া ধুয়া-সমেত শেষ স্তবকের এই যে আদর্শ পাওয়া গেল তাহার তারিখ দেওয়া হইল '১৭।২।৪০' (পাণ্ডু. ১৬৬ -ভুক্ত অন্যের নকলে), অতঃপর লেখায় ও ছাপায় অধিক তফাত হইল না। প্রত্যেক পদের বা অক্ষরের বিচার করিলে, তফাত তবু আছে।

রচনা পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পরে অল্প পরিবর্তনের সাক্ষ্য দেয় আলোচ্য এই ছড়া[৪] আর অধিক পরিবর্তন (অনেক ছত্র বাদ দেওয়া ও যোগ করা) তাহারও সাক্ষ্য দিতেছে যথাক্রমে গ্রন্থের 'প্রবেশক' এবং প্রথম কবিতা। লিপিচিত্রের সহিত প্রথম কবিতা মিলাইবার সুযোগ পাঠকের আছে। প্রবেশক কবিতায় যে ছত্রগুলি রবীন্দ্রসদনের একাধিক পাণ্ডুলিপিতে ও টাইপ কপিতে আছে (শনিবারের চিঠিতেও মুদ্রিত) অথচ গ্রন্থে বর্জিত, তাহা হইল গ্রন্থে দ্বিতীয় স্তবকের চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রের অন্তর্বর্তী—

কালস্রোতের তীরে ব'সে
কে দেয় আকাশ নিংড়ে,
এই যে কী সব লাফিয়ে আসে
এরা কি উচ্চিংড়ে ?

৪ প্রবাসী ধৃত পাঠ— স্ত ১। ছ ৯ : নিলফামারি, স্ত ২। ছ ৩/৪ : শালিখ।/মালিক।,ছ ৯/১০: কাঁকন/আঁকন, ছ ১০ 'উল্কি-দেওয়া' স্থলে : উল্কিছাপের, ছ ১৪ 'মুন্‌শিবাবু' স্থলে : নিতাই মুন্‌সি, স্ত ৪। ছ ১ : হুইসিল, ছ ৭ : ঝাপট ; কবিতার একোনশেষ ছত্রে : না ফেলতেই। দ্বিতীয় স্তবকে 'মেছুনি' এবং শেষ স্তবকে 'হুতোমথুম্ম' ছাপার ভুল হইতেও পারে। শেষ স্তবকে 'শেওলা' প্রবাসীতে ছাপা হইলেও কবি স্বয়ং ইতঃপূর্বে লেখেন 'সিউলি'। অন্তিম পাঠভেদের ক্ষেত্রে মনে হয় গ্রন্থমুদ্রকই দায়ী, 'না ফেলতেই' কবি-ঈপ্সিত সর্বশেষ পাঠ।

শেষ ছত্রের পরে—

ঐ তো হোথায় গাছ উঠেছে
ঐ যে পাখি ওড়ে,
মানুষ করে হানাহানি
এ ওর ঘাড়ে পড়ে।
যুগান্ত যেই মেলবে কবল
ঢুকবে বিরাট ফাঁকে,
কোথাও কিছু রবে কিনা
প্রশ্ন করব কাকে।

তারিখ একই '৫ জানুয়ারি ১৯৪১' বা '২১ পৌষ ১৩৪৭'।

চতুর্থ ছড়ায় ('মামলা') বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি-ধৃত, প্রবাসীতে-মুদ্রিত, কেবল ২ ছত্র গ্রন্থে বর্জিত; উহার স্থান হইতে পারিত চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ ছত্রের মধ্যে—

মোবারক শেখ বলে ফুটো হোলো[৫] গুলিতে
আলুবোখরার এই তিন বোঝা ঝুলিতে!

ছড়াগুলি লেখার সমকালে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লেখেন ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ (৮ আশ্বিন ১৩৪৭) তারিখে, তাহার ভাব ভাষা ছন্দে তেমন লঘুতা চপলতা নাই, নৃত্যভঙ্গি নাই (একন্যই ছড়ার ভূমিকা-রূপে তাহার ব্যবহারও হয় নাই), তবু মনে হয় সেটি আমাদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। এটুকু মনে রাখিলে চলিবে ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় বক্তব্য হয়তো ইহাতে নাই আর একেবারে 'মনোহীন' হওয়া ছড়ার পক্ষে অথবা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বটে।—

[জন্মদিনে। ২০]

মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি…
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,

৫ 'সংশোধিত' পাঠ 'করে' প্রবাসীপত্রে মুদ্রিত।

নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবন্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি—
বিচিত্র তাদের ভঙ্গি, বিচিত্র আকৃতি।
বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর
নিশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনি
জন্মেছি সন্তান,
যখনি মানবকণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া
উঠেছি বাঁচিয়া।
শিশুকণ্ঠে আদিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি।…
মনে মনে দেখিতেছি, সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে,
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।

কালিম্পঙ
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

গ্রন্থপরিচয়-সংকলন : কানাই সামন্ত